সুকুমার রায়-এর

অন্যান্য গল্প

সুকুমার রায়-এর

অন্যান্য গল্প

গ্রন্থিক
প্র কা শ ন

বই পরিকল্পনায় : গ্রন্থিক প্রকাশন
মুদ্রণ : গ্রন্থিক মিডিয়া (প্রিন্টিং প্যাকেজার)

বোকা বুড়ী

এক ছিল বুড়ো আর এক ছিল বুড়ী। তারা ভারি গরীব। আর বুড়ী বেজায় বোকা আর ভয়ানক বেশি কথা বলে — যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয় — তার পেটে কোনও কথা থাকে না।

বুড়ো একদিন তার জমি চষতে চষতে মাটির নিচে এক কলসী পেলে, সেই কলসী ভরা টাকা আর মোহর! তখন তার ভারি ভাবনা হল-এ টাকা যদি ফেলে রাখি কোনদিন কে চুরি ক'রে নেবে। আর যদি টাকা বাড়ি নিয়ে যাই, বুড়ী টের পেয়ে যাবে — সে সকলের কাছে তার গল্প করবে; ক্রমে কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়লে রাজার কোটাল এসে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যাবে। ভেবে ভেবে সে এক ফন্দি আঁটল। সে ঠিক করল যে বুড়ীকে সব কথা বলবে কিন্তু এ রকম উপায় করব যাতে বুড়ীর কথা কেউ না বিশ্বাস করে।

তখন সে একটা মাছ কিনে এনে তার ক্ষেতের ধারে একটা গাছের উপর বে'ধে রাখল, আর একটা খরগোস এনে নদীর ধারে একটা গর্তের মধ্যে জাল দিয়ে জড়িয়ে রাখল। তারপর সে তার স্ত্রীকে গিয়ে বলল, "একটা ভারি আশ্চর্য খবর শুনলাম — গাছের ডালে নাকি মাছ উড়ে বসে আর খরগোস নাকি জলে খেলা করে। আমাদের গণক ঠাকুর বলেন —

"মৎস্য বসেন গাছে
জলে খরগোস নাচে
গুপ্ত রতন খুজলে পাবে খুঁড়লে তারি কাছে।"

বুড়ী বলল, "তোমার যেমন কথা!" বুড়ো বলল, "হাঁ! এরকম নাকি সত্যি সত্যি দেখা গেছে।" এই বলে বড়ো আবার কাজে বেরুল।

আধঘণ্টা না যেতে যেতেই বুড়ো আবার ফিরে এসে ভারি ব্যস্ত হয়ে বুড়ীকে সেই টাকা পাওয়ার কথা বলল। তখন বুড়ো বুড়ী মিলে টাকা আনতে চলল।

পথে যেতে যেতে বুড়ো সেই গাছতলায় এসে বলল, “গাছের উপর চক্‌চক্ করছে কি?” এই বলে সে একটা ঢিল ছুঁড়তেই মাছটা পড়ে গেল। বুড়ী ত অবাক! তখন বুড়ো বলল, “নদীতে জাল ফেলেছিলাম, মাছ-টাছ পড়ল কিনা দেখে আসি।” জাল টানতেই — ওমা! খরগোস যে! তখন বুড়ো বলল, “কেমন! গণক ঠাকুরের কথা আর অবিশ্বাস করবে?” তারপর টাকা নিয়ে তারা বাড়ি এল।

টাকা পেয়েই বুড়ী বলল, “ঘর করব, বাড়ি করব, গহনা বানাব, পোশাক কিনব।” বুড়ো বলল, “ব্যস্ত হয়ো না-কিছুদিন র’য়ে স’য়ে দেখ–ক্রমে সবই হবে। হঠাৎ অত কাণ্ড করলে লোকে সন্দেহ করবে যে।” কিন্তু বুড়ীর তাতে মন উঠে না — সে একে বলে, ওকে বলে; শেষে একবারে কোটালের কাছে নালিশ ক’রে দিল। কোটালের হুকুমে বুড়োকে হাতকড়া দিয়ে হাজির করা হল।

বুড়ো সব কথা শুনে বলল, “সে কি হুজুর! আমার স্ত্রীর কি মাথার কিছু, ঠিক আছে? সে ত ওরকম আবোল তাবোল কত কি বলে।” কোটাল তখন তেড়ে উঠলেন —

“বটে! তুমি টাকা পেয়ে লুকিয়ে রেখেছ — আবার বুড়ীর নামে দোষ দিচ্ছ?” বুড়ো বলল, “কিসের টাকা? কবে পেলাম? কোথায় পেলাম? আমি তো কিছুই জানি না।”

বুড়ী বলল, “না তুমি কিছুই জান না? সেই যেদিন গাছের ডালে মাছ বসেছিল, নদীতে জাল ফেলে খরগোস ধরলে — সেদিনের কথা তোমার মনে নেই? কচি খোকা আর কি?”

তাই শুনে সবাই হাসতে লাগল; কোটাল এক ধমক দিয়ে বুড়ীকে বলল — ”যা পাগলী, বাড়ি যা! ফের যদি এসব যা-তা বলবি তোকে আমি কয়েদ ক’রে রাখব।”

বুড়ী তখন বাড়ি ফিরে গেল। কোটালের ভয়ে সে আর কারু, কাছে টাকার কথা বলত না।

রাগের ওষুধ

কেদারবাবু, বড় বদরাগী লোক। যখন রেগে বসেন, কান্ডাকান্ড জ্ঞান থাকে না।

একদিন তিনি মুখখানা বিষণ্ণ ক’রে বসে আছেন, এমন সময় আমাদের মাস্টারবাবু, এসে বললেন, ‘কি হে কেদারকেষ্ট, মুখখানা হাঁড়ি কেন ?”

কেদারবাবু, বললেন, ‘আর মশাই, বলবেন না। আমার সেই রূপোবাঁধানো হুকোটা ভেঙে সাত টুকরো হয়ে গেল — মুখ হাঁড়ির মত হবে না তো কি বদনার মত হবে?

মাস্টারমশাই বললেন, ‘বল কি হে? এ তো কাচের বাসন নয় কি মাটির পুতুল নয় — অমনি খামখা ভেঙে গেল, এর মানে কি?

কেদারবাবু, বললেন, ‘খামখা ভাঙতে যাবে কেন — কথাটা শুনুন না। হল কী, কাল রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় নি। সকালবেলা উঠেছি, মুখ হাত ধুয়ে তামাক খেতে বসব, এমন সময় কলকেটা কাত হয়ে আমার ফরাসের উপর টিকের আগুন প’ড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি যেই আগুনটা সরাতে গেছি অমনি কিনা আঙুলে ছ্যাঁক্ করে ফোস্কা প’ড়ে গেল! আচ্ছা, আপনিই বলুন — এতে কার না রাগ হয়? আরে, আমার হুঁকো, আমার কলকে, আমার আগুন, আমার ফরাস, আবার আমার উপরেই জুলুম! তাই আমি রাগ ক’রে — বেশি কিছু, নয় — ঐ মুগুরখানা দিয়ে পাঁচ দশ ঘা মারতেই কিনা হতভাগা হুঁকোটা ভেঙে খান্ খান!’

মাস্টারমশাই বললেন, ‘তা যাই বল বাপু, এ রাগ বড় চন্ডাল — রাগের মাথায় এমন কান্ড ক’রে বস, রাগটা একটু, কমাও।’

‘কমাও তো বললেন — রাগ যে মুখের কথায় বাগ মানবে — এ রাগ আমার তেমন নয়।’

“দেখো, আমি এক উপায় বলি। শুনেছি, খুব ধীরে ধীরে এক দুই তিন ক’রে দশ গুনলে—রাগটা নাকি শান্ত হয়ে আসে। কিন্তু তোমার যেমন রাগ, তাতে দশ-বারোতে কুলোবে না—তুমি একেবারে একশো পর্যন্ত গুনে দেখো।’

তারপর একদিন কেদারবাবু ইস্কুলের সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। তখন ছুটির সময়, ছেলেরা খেলা করছে। হঠাৎ একটা মার্বেল ছুটে এসে কেদারবাবুর পায়ের হাড়ে ঠাঁই করে লাগল। আর যায় কোথা! কেদারবাবু ছাতের সমান এক লাফ দিয়ে লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ছেলের দল যে যেখানে পারে একেবারে সটান চম্পট্। তখন কেদারবাবুর মনে হল মাস্টারবাবুর কথাটা একবার পরীক্ষা ক’রে দেখি। তিনি আরম্ভ করলেন, এক–দুই–তিন–চার–পাঁচ—

ইস্কুলের মাঝখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে অঙ্ক বলছে, তাই দেখে ইস্কুলের দারোয়ান ব্যস্ত হয়ে কয়েকজন লোক ডেকে আনল। একজন বলল, ‘কী হয়েছে মশাই?’ কেদারবাবু বললেন, ‘ষোলো—সতেরো–আঠারো—উনিশ–কুড়ি—’

সকলে বলল, ‘এ কী? লোকটা পাগল হল নাকি?—আরে, ও মশাই, বলি অমন-ধারা কচ্ছেন কেন?’ কেদারবাবু মনে মনে ভয়ানক চটলেও—তিনি গুনেই চলেছেন, ‘ত্রিশ–একত্রিশ–বত্রিশ–তেত্রিশ—’

আবার খানিক বাদে আর একজন জিজ্ঞাসা করল, ‘মশাই, আপনার কি অসুখ করেছে? কবরেজ মশাইকে ডাকতে হবে?’ কেদারবাবু রেগে আগুন হয়ে বললেন, ‘উনষাট–ষাট–একষট্টি–বাষট্টি–তেষট্টি—’

দেখতে দেখতে লোকের ভিড় জমে গেল–চারিদিকে গোলমাল, হৈ চৈ। তাই শুনে মাস্টারবাবু দেখতে এলেন, ব্যাপারখানা কি! ততক্ষণে কেদারবাবুর গোনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিনি দুই চোখ লাল করে লাঠি ঘোরাচ্ছেন আর বলছেন, ‘ছিয়ানব্বুই–সাতানব্বুই–আটানব্বুই–নিরেনব্বুই–একশো—কোন্ হতভাগা লক্ষীছাড়া মিথ্যা-বাদী বলেছিল একশো গুনলে রাগ থামে?’ বলেই ডাইনে বাঁয়ে দুমদাম, লাঠির ঘা।

লোকজন সব ছুটে পালাল। আর মাস্টারমশাই এক দৌড়ে সেই যে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, আর সারাদিন বেরোলেন না।

পালোয়ান

তাহার আসল নামটি যে কি ছিল, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছি—কারণ আমরা সকলেই তাহাকে “পালোয়ান” বলিয়া ডাকিতাম। এমন কি মাস্টারমহাশয়েরা পর্যন্ত তাহাকে “পালোয়ান” বলিতেন। কবে কেমন করিয়া তাহার এরূপ নামকরণ হইল, তাহা মনে নাই; কিন্তু নামটি যে তাহাকে বেশ মানাইয়াছিল, একথা স্কুল শুদ্ধ সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিত।

প্রথমত, তাহার চেহারাটি ছিল একটু অতিরিক্ত রকমের হৃষ্টপুষ্ট। মোটা সোটা হাত পা, ব্যাঙের মত গোবদা গলা—তাহার উপরেই গোলার মতো মাথাটি—যেন ঘাড়ে পিঠে এক হইয়া গিয়াছে। তার উপর সে কলিকাতায় গিয়া স্বচক্ষে কাল্লু ও করিমের লড়াই দেখিয়া আসিয়াছিল, এবং বড় বড় কুস্তির এমন আশ্চর্য রকম বর্ণনা দিতে পারিত যে,শুনিতে শুনিতে আমাদেরই রক্ত গরম হইয়া উঠিত। এক এক দিন উৎসাহের চোটে আমরাও তাল ঠুকিয়া স্কুলের উঠানে কুস্তি বাধাইয়া দিতাম। পালোয়ান তখন পাশে দাঁড়াইয়া নানারকম অঙ্গভঙ্গী করিয়া আমাদের প্যাঁচ ও কায়দা বাতলাইয়া দিত। মাখনলাল আমার চাইতে আড়াই বছরের ছোট, কিন্তু পালোয়ানের কাছে “ল্যাং মূচকির” প্যাঁচ শিখিয়া সে যেদিন আমায় চিৎপাত করিয়া ফেলিল, সেইদিন হইতে সকলেরই বিশ্বাস হইল যে পালোয়ান ছোকরাটা আর কিছু না বুঝুক কুস্তিটা বেশ বোঝে।

ঘোষেদের পাঠশালার ছাত্রগুলি বেজায় ডানপিটে। খামখা এক একদিন আমাদের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া তাহারা ঝগড়া বাধাইত। মনে আছে, একদিন ছুটির পরে আমি আর পাঁচ সাতটি ছেলের সঙ্গে গোঁসাইবাড়ির পাশ দিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় দেখি পাঠশালার চারটা ছোকরা ঢেলা মারিয়া আম পাড়িতেছে। একটা ঢিল আরেকটু হইলেই আমার গায়ে পড়িত। আমরা দলে ভারি ছিলাম, সেই সাহসে আমাদের একজন ধমক দিয়া উঠিল,

“এইও, বেয়াদব! মানুষ চোখে দেখিস নে?” ছোকরাদের এমনি আস্পর্ধা, একজন অমনি বলিয়া উঠিল, “হাঁ, মানুষ দেখি, বাঁদরও দেখি!”—শুনিয়া বাকী তিনটায় অসভ্যের মত হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। আমার তখন ভয়ানক রাগ হইল, আমি আস্তিন গুটাইয়া বলিলাম, “পরেশ! দে ত আচ্ছা ক’রে ঘা দুচ্চার কষিয়ে।” পরেশও দমিবার পাত্র নয়, সে হুঙ্কার দিয়া বলিল, “গুপে, আনত ওই ছোকরাটার কানে ধ’রে।” গোপীকেষ্ট বলিল, “আমার হাতে বই আছে—ওরে ভুতো, তুই ধর্ দেখি একবার চেপে—”। ভুতোর বাড়ি বাঙাল দেশে-তার মেজাজটি যখন মাত্রায় চড়ে তখন তার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না—সে একটা ছোকরার কানে প্রকাণ্ড এক কীল বসাইয়া দিল। কলি খাইয়াই সে হতভাগা একেবারে ‘গোবরাদা’ বলিয়া চিৎকার দিয়া উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বাকী তিনজনও ‘গোবরাদা’, ‘গোবরাদা’ বলিয়া এমন একটা হৈ চৈ রব তুলিল যে, আমরা ব্যাপারটা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া রহিলাম। এমন সময় একটা কুচকুচে কালো মূর্তি হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল। আসিয়াই আর কথাবার্তা না বলিয়াই ভুতোর ঘাড়ে ধাক্কা মারিয়া, গুপের কান মলিয়া, আমার গালে ঠাসঠাস, দুই চড় লাগাইয়া দিল। তারপর কাহার কি হইল আমি খবর রাখিতে পারি নাই। মোট কথা, সেদিন আমাদের যতটা অপমান বোধ হইয়াছিল, ভয় হইয়াছিল তাহার চাইতেও বেশি। সেই হইতে গোবরার নাম শুনিলেই ভয়ে আমাদের মুখে শুকাইয়া আসিত।

পালোয়ানের কেরামতির পরিচয় পাইয়া আমাদের মনে ভরসা আসিল। আমরা ভাবিলাম, এবার যেদিন পাঠশালার ছেলেগুলো আমাদের ভ্যাংচাইতে আসিবে, তখন আমরাও আরো বেশি করিয়া ভ্যাংচাইতে ছাড়িব না। পালোয়ানও এ কথায় খুব উৎসাহ প্রকাশ করিল। কিন্তু অনেকদিন অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহাদের ঝগড়া বাধাইবার আর কোন মতলব দেখা গেল না, তখন আমাদের মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। আমরা বলিতে লাগিলাম, “ওরা নিশ্চয়ই পালোয়ানের কথা শুনতে পেয়েছে।” পালোয়ান বলিল—“হ্যাঁ, তাই হবে। দেখছ না, এখন আর বাছাদের টুঁ শব্দটি নেই।” তখন সবাই মিলিয়া স্থির করিলাম যে পালোয়ানকে সঙ্গে লইয়া গোবরার দলের সঙ্গে ভালরকম বোঝাপড়া করিতে হইবে।

শনিবার দুইটার সময় স্কুল ছুটি হইয়াছে, এমন সময় কে যেন আসিয়া খবর দিল যে গোবরা চার-পাঁচটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া পুকুরঘাটে বসিয়া গল্প করিতেছে। যেমন শোনা অমনি আমরা দলেবলে হৈ হৈ করিতে করিতে সেখানে গিয়া হাজির! আমাদের ভাবখানা দেখিয়াই বোধ হয় তাহারা বুঝিয়াছিল যে আমরা কেবল বন্ধুভাবে আলাপ করিতে আসি নাই। তাহারা শশব্যস্ত হইয়া উঠিতে না উঠতেই আমরা তিন-চারজনে মিলিয়া গোবরাকে একেবারে চাপিয়া ধরিলাম। সকলেই ভাবিলাম, এ-যাত্রায় গোবরার আর রক্ষা নাই। কিন্তু আহাম্মক রামপদটা সব মাটি করিয়া দিল। সে বোকারাম ছাতা হাতে হাঁ করিয়া তামাসা দেখিতেছিল, এমন সময় পাঠশালার একটা ছোকরা এক থাবড়া মারিয়া তাহার ছাতাটা কাড়িয়া লইল। আমরা ততক্ষণে গোবরা-চাঁদকে চিৎপাত করিয়া আনিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ আমাদের ঘাড়ে পিঠে ডাইনে বাঁয়ে ধপাধপ, ছাতার বৃষ্টি শব্দে হইল। আমরা মুহূর্তের মধ্যে একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলাম, আর সেই ফাঁকে গোবরাও এক লাফে গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। তাহার পর চক্ষের নিমেষে তাহারা আমাদের চার-পাঁচজনকে ধরিয়া পকুরের জলে ভালরকমে চুবাইয়া রীতিমত নাকাল করিয়া ছাড়িয়া দিল। এই বিপদের সময় আমাদের দলের আর সকলে কে যে কোথায় পালাইল, তাহার আর কিনারাই করা গেল না। সব চাইতে আশ্চর্য এই যে, ইহার মধ্যে পালোয়ান যে কখন নিরুদ্দেশ হইল,—তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া আমাদের গলা ফাটিয়া গেল, তবু, তাহার সাড়া পাইলাম না।

সোমবার স্কুলে আসিয়াই আমরা সবাই মিলিয়া পালোয়ানকে গাল দিতে লাগিলাম। কিন্তু সে যে কিছুমাত্র লজ্জিত হইয়াছে, এমন বোধ হইল না। সে বলিল—“তোরা যে এমন আনাড়ি, তা জানলে কি আমি তোদের সঙ্গে যাই? আচ্ছা, গোবরা যখন তোর টুঁটি চেপে ধরল, তখন আমি যে ডানপটকান দে’ ব’লে এত চে’চালাম—কৈ, তুই তো তার কিছুই করলি না। আর ঐ গুপেটা, ওকে আমি এতবার বলেছি যে ল্যাংমুচকি মারতে হ’লে পাল্টা রোখ সামলে চলিস—তা তো ও শুনবে না! এরকম করলে আমি কি করব বল? ওসব দেখে আমার একেবারে ঘেন্না ধ’রে গেল—তাই বিরক্ত হয়ে চ’লে এলুম। তারপর ভুতোটা, ওটা কি করল বল দেখি! আরে, দেখছিস যখন দোরোখা প্যাঁচ, মারছে, তখন বাপু, আহ্লাদ ক’রে কাৎ হ’য়ে পড়তে গেলি কেন?”—ভুতো এতক্ষণ কিছু বলে নাই, কিন্তু পালোয়ানের এই টিপ্পনী কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত তাহার মেজাজের উপর ছ্যাঁক করিয়া লাগিল। সে গলায় ঝাঁকড়া দিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, “তুমি বাপু, কানকাটা কুকুরের মত পলাইছিলা ক্যান? সর্বনাশ! পালোয়ানকে “কানকাটা কুকুর” বলা! আমরা ভাবিলাম “দেখ, বাঙাল মরে বুঝি এবার!” পালোয়ান খুব গম্ভীর

হইয়া বলিল, “দেখ বাঙাল! বেশী চালাকি করিস তো চরকী প্যাঁচ লাগিয়ে একেবারে তুর্কী নাচন নাচিয়ে দেব!” ভুতো বলিল, “তুমি নাচলে বান্দর নাচবা।” রাগে পালোয়ানের মুখেচোখ লাল হইয়া উঠিল। সে বেঞ্চি ডিঙাইয়া একেবারে বাঙালের ঘাড়ে গিয়া পড়িল। তারপর দুইজনে কেবল হুড়াহুড়ি আর গড়াগড়ি। আশ্চর্য এই, পালোয়ান এত যে কায়দা আর এত যে প্যাঁচ আমাদের উপর খাটাইত, নিজের বেলায় তার একটিও তাহার কাজে আসিল না। ঠিক আমাদেরই মত হাত-পা ছুঁড়িয়া সে খামচা-খামচি করিতে লাগিল। তারপর বাঙাল যখন তাহার বুকের উপর চড়িয়া দুই হাতে তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিল, তখন আমরা সকলে মিলিয়া দুজনকে ছাড়াইয়া দিলাম। পালোয়ান হাঁপাইতে হাঁপাইতে বেঞ্চে বসিয়া ঘাম মুছিতে লাগিল। তারপর গম্ভীরভাবে বলিল, “গত বছর এই ডান হাতের কব্জিটা জখম হয়েছিল—তাই বড় বড় প্যাঁচগুলো দিতে ভরসা হয় না—যদি আবার মচকে ফচকে যায়! তা নৈলে ওকে একবার দেখে নিতুম।” ভূতো এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, তাহার নাকের সামনে একবার বেশ করিয়া “কাঁচকলা” দেখাইয়া লইল।

ভুতো ছেলেটি দেখিতে যেমন রোগা এবং বেঁটে, তার হাত-পাগুলিও তেমনি লটপটে, পালোয়ানের পালোয়ানী সম্বন্ধে অনেকের যে আশ্চর্য ধারণা ছিল, সেই দিনই তাহা ঘুচিয়া গেল। কিন্তু পালোয়ান নামটি আর কিছুতেই ঘুচিল না, সেটি শেষ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল।

হাসির গল্প

আমাদের পোস্টাপিসের বড়বাবুর বেজায় গল্প করিবার সখ। যেখানে সেখানে সভায় আসরে নিমন্ত্রণে, তিনি তাঁহার গল্পের ভান্ডার খুলিয়া বসেন। দুঃখের বিষয়, তাঁর ভান্ডার অতি সামান্য—কতগুলি বাঁধা গল্প, তাহাই তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া সব জায়গায় চালাইয়া দেন। কিন্তু একই গল্প বারবার শুনিতে লোকের ভাল লাগিবে কেন? বড়বাবুর গল্প শুনিয়া আর লোকের হাসি পায় না। কিন্তু তবু, বড়বাবুর উৎসাহও তাহাতে কিছুমাত্র কমে না।

সেদিন হঠাৎ তিনি কোথা হইতে একটা নূতন গল্প সংগ্রহ করিয়া, মুখেজ্জেদের মজলিসে শুনাইয়া দিলেন। গল্পটা অতি সামান্য কিন্তু তবু বড়বাবুকে খাতির করিয়া সকলেই হাসিল। বড়বাবু, তাহা বুঝিলেন না, তিনি ভাবিলেন গল্পটা খুব লাগসই হইয়াছে। সুতরাং, তার দুদিন বাদে যদু মল্লিকের বাড়ি নিমন্ত্রণে বসিয়া, তিনি খুব আড়ম্বর করিয়া আবার সেই গল্প শুনাইলেন। দু একজন, যাহারা আগে শোনে নাই, তাহারা শুনিয়া বেশ একটু হাসিল। বড়বাবু ভাবিলেন গল্পটা জমিয়াছে ভাল।

তারপর ডাক্তারবাবুর ছেলের ভাতে তিনি আবার সেই গল্পই খুব উৎসাহ করিয়া শুনাইলেন। এবারে ডাক্তারবাবু ছাড়া আর কেহ গল্প শুনিয়া হাসিল না, কিন্তু বড়বাবু নিজেই হাসিয়া কুটি কুটি।

তারপরেও যখন তিনি আরও দু তিন জায়গায় সেই একই গল্প চালাইয়াদিলেন, তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বিষম চটিয়া গেল। বিশু বলিল, “না হে, আর ত সহ্য হয় না। বড়বাবু, ব’লে আমরা এতদিন সয়ে আছি—কিন্তু ওঁর গল্পের উৎসাহটা একটু না কমালে চলছে না।”

দুদিন বাদে, আমরা দশবারোজনে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় বড়বাবুর নাদুস নদুস মূর্তিখানা দেখা দিল। আমরা বলিলাম, “আজ খবরদার! ওঁর গল্প

শুনে কেউ হাসতে পাবে না! দেখি উনি কি করেন।” বড়বাবু বসিতেই বিশু বলিয়া উঠিল, “নাঃ, বড়বাবু আজকাল যেন কেমন হ’য়ে গেছেন। আগে কেমন মজার মজার সব গল্প বলতেন। আজকাল, কৈ? কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন।” বড়বাবু, একথায় ভারি ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁর গল্প আর আগের মত জমে না, একথাটি তাঁহার একটুও ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, “বটে? আচ্ছা রোস। আজ তোমাদের এমন গল্প শোনাব, হাসতে হাসতে তোমাদের নাড়ি ছিঁড়ে যাবে।” এই বলিয়া তিনি তাঁহার সেই মামুলি পুঁজি হইতে একটা গল্প আরম্ভ করিলেন। কিন্তু গল্প বলিলে কি হইবে? আমরা কেহ হাসিতে রাজি নহি—সকলেই কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলাম। বিশু বলিল, “নাঃ, এ গল্পটা জুৎসই হল না।” তখন বড়বাবু তাঁহার সেই পুঁজি হইতে একে একে পাঁচ সাতটি গল্প শুনাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে সকলের মুখে পেঁচার মত আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল! তখন বড়বাবু ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, “যাও যাও! তোমরা হাসতে জান না—গল্পের কদর বোঝ না—আবার গল্প শুনতে চাও! এই গল্প শুনে সেদিন ইনস্পেক্টার সাহেব পর্যন্ত হেসে গড়াগড়ি—তোমরা এসব বুঝবে কি?” তখন আমাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, “সে কি বড়বাবু? আমরা হাসতে জানিনে? বলেন কি! আপনার গল্প শুনে কতবার কত হেসেছি, ভেবে দেখুন ত’। আজকাল আপনার গল্পগুলো তেমন খোলে না—তা হাসব কোত্থেকে? এই ত, বিশুদা যখন গল্প বলে তখন কি আমরা হাসিনে? কি বলেন?”

বড়বাবু হাসিয়া বলিলেন, “বিশু? ও আবার গল্প জানে নাকি? আরে, এক সঙ্গে দুটো কথা বলতে ওর মুখে আটকায়, ও আবার গল্প বলবে কি?” বিশু বলিল, “বিলক্ষণ! আমার গল্প শোনেন নি বুঝি?” আমরা সকলে উৎসাহ করিয়া বলিলাম—“হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা শুনিয়ে দাও ত।” “বিশু তখন গম্ভীর হইয়া বলিল, “এক ছিল রাজা”—শুনিয়া আমাদের চার পাঁচজন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, “আরে রাজার গল্প রে রাজার গল্প!—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।”

বিশু বলিল, “রাজার তিনটা ধাড়ি ধাড়ি ছেলে” —

শুনিবামাত্র আমরা একসঙ্গে প্রাণপণে এমন সশব্দে হাসিয়া উঠিলাম যে, বিশু নিজেই চমকাইয়া উঠিল। সকলে হাসিতে হাসিতে, এ উহার গায়ে গড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম—কেহ বলিল, “দোহাই বিশুদা, আর হাসিও না”—কেহ বলিল, “বিশুবাবু, রক্ষে করুন, ঢের হয়েছে।” কেহ কেহ এমন ভাব দেখাইল, যেন হাসিতে হাসিতে তাহাদের পেটে খিল ধরিয়া গিয়াছে।

বড়বাবু কিন্তু বিষম চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, “এসব ঐ বিশুর কারসাজি। ওই আগে থেকে সব শিখিয়ে এনেছে। নইলে, ও যা বললে তাতে হাসবার মত কি আছে বাপু?” এই বলিয়া তিনি রাগে গজ গজ করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন।

সেই সময় হইতে বড়বাবুর গল্প বলার সখটা বেশ একটু, কমিয়াছে। এখন আর তিনি যখন তখন কথায় কথায় হাসির গল্প ফাঁদিয়া বসেন না।